লোক-প্রশাসন অধ্যয়নে প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা

মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও আধুনিক সভ্যতা বিনির্মাণে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে আজকের দিনে এই চমক্প্রদ সাফল্যের পেছনে মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে 'মানবিক প্রযুক্তি', অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সাংগঠনিক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির ব্যাপকতা মহাকাশ গবেষণা হতে শুরু করে, কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষের এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অপর অর্থ হচ্ছে 'লোক-প্রশাসন' যা সরকার নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ্ক্রমভিত্তিক সংগঠন ও নিয়ম-নীতির কাঠামোয় পরিচালিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম প্রক্রিয়া।

যুগে যুগে, লোক-প্রশাসনকে সাংগঠনিকভাবে সুসংহতকরণ ও এর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মনিষীদের চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও বাস্তব প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কালক্রমে যে জ্ঞান ভান্ডার গড়ে উঠেছে, তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণীকক্ষে অধ্যয়নের জন্য 'লোক-প্রশাসন' নামে এক পৃথক পাঠ্য শৃঙ্খলা। ঢাকা ও চট্টগ্রামের পর, রাজশাহী, সিলেট, কুষ্টিয়া এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-প্রশাসন বিষয়ে পৃথক বিভাগ গড়ে উঠেছে, এবং সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা পর্যায়ে বিষয়টি প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লোক-প্রশাসন বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে যে সকল কোর্স পড়ানো হয়ে থাকে, সে সম্পর্কিত পাঠ্য উপকরণসমূহ গড়ে উঠেছে বিগত একশত বৎসরের মধ্যে, এবং তাও পাশ্চাত্য দুনিয়ায় (বিশেষতঃ আমেরিকায়)। প্রশ্ন উঠেছে, পাশ্চাত্য পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হওয়া এ সকল পাঠ্য উপকরণ বাংলাদেশের মত প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশের ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে কতটুকু প্রয়োগ উপযোগী ? আরবের খেজুরগাছ যেমন বাংলাদেশের মাটিতে ফলবেনা, তেমনি পাশচাত্যের সফল উন্নয়ন মডেল প্রাচ্যের দেশসমূহে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন না করাটাই স্বাভাবিক । অতএব, বিশেষজ্ঞগণও আজ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কোন দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার প্রয়োজনে সেসবকে সংশ্লিষ্ট দেশের পরিবেশ, মানুষের জীবনাচরণ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন। লোক-প্রশাসনের উপর পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কিত Fred W.Riggs -Gi *The Ecology of Public Administration* (১৯৭৫) এবং Farrel Heady কর্তৃক তুলনামূলক লোক-প্রশাসন বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে রচিত, *Public Administration :A Comparative Perspective* (১৯৮৪) ইত্যাদি গ্রন্থে বিশেষ গু রুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে যে, ÒNo Model can be sound and effective unless it is grounded in the culture and ideology for the people which it is constructed to serve" (Buraey,১৯৭৮: ২৯৭)। আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণা, সংগঠন ও কর্ম প্রক্রিয়া বা নিয়ম-নীতির সবকিছুই পাশচাত্য হতে ধার করা। এ জাতীয় প্রশাসন ব্যবস্থা দেশবাসীকে কাংখিত সেবা প্রদানে শুধু ব্যর্থই নয়, জনগণের স্বাভাবিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তার উপর রয়েছে চরম অদক্ষতা ও দুর্নীতির ভয়াবহ অভিশাপ। বিশ্বব্যাংক ও *ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের* বার্ষিক রিপোর্টে একথাই উল্লেখিত হয়ে আসছে বার বার। আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনেকটা দাঁড়কাকের মত, ময়ূরের সুন্দর পুচ্ছ বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গীকে অনুসরণ করতে গিয়ে ময়ূরও হতে পারছিনা, আবার অতি অনুকরণ প্রচেষ্টায় নিজদের মৌলিকত্বও ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। ফলে আমরা পরিণত হয়েছি অনেকটা ময়ূর ও কাকের মাঝামাঝি দাঁড়কাকে! এসকল বিষয় পরিমিত তথ্য ও উপাত্তসহকারে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে Dr Doh Joon-Chien iwPZ, *Eastern Intellectuals and Western Solutions: Follower Syndrom in Asia* (1980); Dr Anisur Rahman -Gi, *People's Self- Development* (১৯৯৪); এবং Dr. Mohammad Al-Buraey-Gi *Administrative Development:An Islamic Perspective* (১৯৮৫) শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে। এরা সবাই পাশ্চাত্যের সর্বোন্নত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং উন্নয়নকর্মে অভিজ্ঞ প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী।

আমরা পাশ্চাত্যের চমক্প্রদ উন্নয়নে বিমোহিত হলেও আমাদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি কি, সেসম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। পশ্চিম গোলার্ধে বসবাসকারী উন্নত বিশ্বের জনগণ বিশেষতঃ ইউরোপীয়ানরা চিরদিনই আমাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। তাদের দৃষ্টিতে আমরা হচ্ছি সমুদ্রের এপারে বা তাদের ভাষায় *অরিয়েন্ট* বা প্রাচ্যে বসবাসকারী কতিপয় পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠী। সাগরের পূর্বাঞ্চলের এই

আনসিভিলাইজড জনপদকে সভ্য করার ব্রত নিয়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক অধিপতি আলেকজান্ডার মিশর ও পারস্য হয়ে ভারত অবধি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলেন। একাডেমিক পরিভাষায় আমরা হচ্ছি *অরিয়েন্ট* বা প্রাচ্য। পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে যা পশ্চিমা নয়, তাই *অরিয়েন্ট* বা প্রাচ্য। পশ্চিমারা মনে করে, প্রাচ্য মানেই অবাস্তব, *আনসিভিলাইজড*, বর্বর ও অনুন্নত। বাস্তব জীবন আছে কেবল পশ্চিমাদের কেননা, তাদের আছে ক্ষমতা, রাজনীতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। *অরিয়েন্টের* ভেতর পশ্চিম খুঁজে পায় কেবল দুর্বলতা, অবাস্তবতা, কুসংস্কার, মালিন্য ও *রোমান্টিকতা*। *অরিয়েন্টের* ভাষা নাকি অনান্দনিক এবং শিক্ষায় আছে বোধশূন্যতা ও যান্ত্রিকতা, কেননা *অরিয়েন্টরা আদার* বা ভিন্ন, পশ্চাদ্‌পদ ও হীনমন্য জনগোষ্ঠী। আমাদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এসকল দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Edward W. Said ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত, *Orientalism* (প্রাচ্যতত্ত্ব) শীর্ষক গ্রন্থে। সাইদের ভাষায়, "প্রাচ্যতাত্ত্বিক ভাবনার ভিত্তি হল পৃথিবীকে কল্পনায় অসম দুই ভাগে বিভক্তকারী তীব্র দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ভূগোল। 'ভিন্ন' ধরণের বড় অংশটার নাম 'প্রাচ্য' ; 'আমাদের' বলে অন্য অংশটিকে বলা হয় 'পাশ্চাত্য' বা পশ্চিম (Said, ১৯৭৮:৪৯-৭৩)। *অরিয়েন্টালিজম* মূলতঃ পশ্চিমের একটি বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানভাষ্য (Discourse)| এই গ্রন্থে সাঈদ তদন্ত করেছেন কিভাবে পশ্চিমাদের জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতা, পান্ডিত্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিদ্যার সঙ্গে ঔপনিবেশিকতা সংযুক্ত হয়েছিল। প্রাচ্যকে উপনিবেশ বানাতে হলে প্রাচ্যকে জানতে হবে একেবারে নিজের মত করে। পশ্চিমের প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা এভাবে প্রাচ্যকে জেনেছেন খ্রিস্টান মিশনারী (*ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি*) পাঠিয়ে, ইউরোপীয় পরিব্রাজকের ভ্রমন কাহিনী (পর্তুগীজ নাবিক টম পিয়ার্সের *সুমা অরিয়েন্টেল* ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন স্টাডি সর্কেলের (*এশিয়াটিক সোসাইটি* ইত্যাদি) সাহায্যে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান কর্তৃক মিশর দখলের পরিকল্পনাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রথমে একদল প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিত প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তীতে আরেকটি নতুন ও দীর্ঘ অধ্যায়ের শুরু হয় যখন French Institute of Oriental Studies -G Silvestre de Sacy -এর তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স হয়ে উঠে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশ্বগুরু। এই অধ্যায়ের চরম পরিণতি পায় কিছুদিন পর ১৮৩০ সালে ফরাসি সেনাবাহিনী কর্তৃক আলজিরিয়া দখলের ঘটনায়। অনুরূপভাবে, ইতালী দখল করে নেয় লিবিয়া, হল্যান্ডের উপনিবেশে পরিনত হয় ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুন্জ এবং মালয়েশিয়া ও বার্মা হতে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবধি বিস্তীর্ণ এলাকার উপর শাসন কায়েম করে ইংল্যান্ড। উল্লেখ্য যে, বাংলায় সামরিক আগ্রাসন চালানোর পূর্বে বৃটিশরা Charles Grant নামক এক প্রাচ্যতাত্ত্বিককে নিয়োগ করেছিল বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের আচার-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য। পরবর্তীকালে পুরা উপমহাদেশ দখলের পর, ইংল্যান্ড প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সুকৌশলে এতদ্‌অঞ্চলের উপর দীর্ঘমেয়াদী ঔপনিবেসিক শাসনের প্রাতিষ্ঠানিকরণ সম্পন্ন করে। উল্লেখ্য যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এখনও পরিচালিত হচ্ছে প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঝঙঅঝ (School of Oriental and African Studies) গবেষণা কেন্দ্র। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, *অরিয়েন্টালিজম* একটি বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকল্প মাত্র। কিন্তু বিভিন্ন উদাহরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাঈদ দেখান যে, *অরিয়েন্টালিজম* বিদ্যাচর্চার অন্তরালে এক বিচিত্র ও নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির প্ররোচনা ও সহিংস সাম্রাজ্যবাদ অসামান্য চাতুর্যে বিস্ফারিত। কিন্তু পশ্চিমারা যাই ভাবুক না কেন, আমাদের *অরিয়েন্ট* তো একটা বাস্তব ভৌগলিক সত্য যার রয়েছে নিজস্ব আখ্যান, জনপদ, সংস্কার, ঐতিহ্য ও ইতিহাস; আছে নিজস্ব ভাষা, ভাবনা ও জীবনধারা। *অরিয়েন্ট* তো নিজেই নিজের ঐতিহাসিকতা তৈরী করেছে। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি বলপ্রয়োগ ও কর্তৃত্ব বিস্তারের মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিকতাকে কিছুটা বদলে দিয়েছে মাত্র।

কিন্তু যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জোরে পাশ্চাত্য আজ উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে,
আমরা অনেকেই জানিনা যে, মানবজাতির এই অভিন্ন সম্পদ গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রাচ্যের মুসলমানদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আজ হতে প্রায় বার শত বৎসর পূর্বে, রাজধানী হিসাবে বাগদাদের প্রতিষ্ঠালগ্নকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য খলিফা আল্‌-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫খ্রিঃ) আহবান করেছিলেন এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন (৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে)। ওই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল পৃথিবীর পরিধির নিখুঁত মাপ নির্ধারণ করা। আল্‌-মনসুরের উদ্যোগে ওই সময়ে বিশ্বের যেখানে যত নামকরা পন্ডিত ছিলেন তাঁদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে ভারতীয় ব্রাহ্মণ পন্ডিত কংকা **দশমিকের অংক** উপস্থাপন করেছিলেন। এই দশমিকই আজ অংকশাস্ত্র, হিসাব বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান তথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তি। তারও পূর্বে, আরব বিজ্ঞানী আল্‌-খাওয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রিঃ) মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বন্টন ও *জাকাতের* সঠিক পরিমান নির্ধারনে শূন্য ও সংখ্যার ব্যবহারিক মান নির্ধারণ করে বিজ্ঞানচর্চাকে উল্লম্ফন প্রদান করেছিলেন। তাঁকে বলা হয় বীজগণিত ও আধুনিক *কম্পিউটারের* আদি পিতা।

কম্পিউটারের সাহায্যে জটিল অংকের সমাধানে বিশেষ পদ্ধতি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত algoritham শব্দটি তাঁর নামেরই ইংরেজি সংস্করণ। এই বীজগণিত ও *আলগরিথামই* পরবর্তীতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীদেরকে *কম্পিউটার* উদ্ভাবনের পথ করে দিয়েছে। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, *হিসাব-আল-জবর ওয়াল মুকাবালা* নামক গ্রন্থটি তাকে অমরত্ব প্রদান করেছে। ইব্‌নে হাইতাম (Ibn Haytham) নামক অপর মুসলিম বৈজ্ঞানিক গবেষনায় 'পরীক্ষণ বিজ্ঞানের' (Experimental Science) প্রতিষ্ঠাতা যিনি আলোক বিজ্ঞানী হিসাবেও পরিগনীত। সে সময়কার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইরানের আল্-বেরুনী তাঁর রচিত *কিতাব-উল-হিন্দে* স্বীকার করেছেন যে, তিনি জ্ঞানের অন্বেষায় সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করে বার বৎসর ধরে ভারতের ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের পায়ের কাছে বসে পাঠশালার শিক্ষার্থীদের মত জ্ঞানচর্চা করেছেন। আল্-বেরুনী সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানী আবদুস সালামের অভিমত হচ্ছে, তিনিই মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রগুলির বিশ্বজনীনতা তুলে ধরেছিলেন। ইউরোপীয় *রেনেসাঁর* (গণজাগরণ) মূলেও ছিল মুসলিম পন্ডিতদের গবেষণা বিশেষতঃ শত শত বৎসর ধরে ইউরোপে নিষিদ্ধ ঘোষিত গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের (বিশেষতঃ এরিষ্টোটলের *পলিটিক্স* ইত্যাদি গ্রন্থ) অনুবাদ ও প্রচার। একজন পাশ্চাত্য গবেষক লিখেছেন, "শত শত বৎসর ধরে ইসলামের সৃজনশীল প্রতিভা মধ্যযুগীয় বিশ্বকে বিজ্ঞান, দর্শন এবং শিল্পকলায় এগিয়ে নিয়েছে এমনকি, এর রাজনৈতিক পতন শুরু হওয়ার পরও" (Lichtenstadter,১৯৫০:২২)। উপরোক্ত বক্তব্যের ধারায় বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ ড. Montgomery Watt তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন, "বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় মুসলমানদের (তিনি 'আরবী' শব্দ ব্যবহার করেছেন) অবদান ব্যতিরেকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন আজ এভাবে অগ্রগতি লাভ করতে পারতনা" (Watt, ১৯৭২; এবং Schacht and Bosworth, ১৯৭৪)।

বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচারিত গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যদি হয় আইনের শাসন, তার প্রাথমিক সূচনা ঘটেছিল পাশ্চাত্যে নয়, দজলা ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় অবস্থিত প্রাচীনতম ভূমি ব্যবিলনে, আজ যেখানে ইরাক নামের দেশটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত। পাশ্চাত্যের মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায় পশুর ন্যায় জীবন যাপন করছিল, তখন মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম আইন রচিত হয়েছিল ব্যবিলনে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সূতিকাগার বলে বিবেচিত প্রাচীন গ্রীসেরও বহু আগে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে ব্যবিলনের প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ শাসক হাম্মুরাবি (১৭০২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব) প্রণয়ন করেছিলেন এক শাসনবিধি যেটি ইতিহাসে *Code of Hammurabi* বা *হাম্মুরাবির দন্ডবিধি* নামে পরিচিত। অর্থনৈতিক (মূল্য, শুল্ক ও বাণিজ্য), পারিবারিক (বিয়ে ও তালাক), ফৌজদারি (হামলা ও চুরি) ও দেওয়ানি (দাসত্ব ও ঋণ) ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ২৮২টি বিষয়ে আইনের সমাহার হাম্মুরাবির ওই দন্ডবিধি ছিল এক বিশদ আইন। অপরদিকে, প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমার্ত্য সেন বলেছেন, "গণতন্ত্র কেবল পশ্চিমা কিংবা কোন ইউরোপীয় ধারণা ভাবাটা ভুল হবে ...একই সময়ে ইরান ও ভারতীয় সমাজও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতি-নীতির চর্চা করেছে"। তাঁর মতে, "চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণতন্ত্র ব্যাপকতম অর্থে জনগণের বিচারবুদ্ধির অনুশীলন... ভারতে যুক্তিসহকারে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠানের এক সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী ঐতিহ্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকাশ্যে জনসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সম্রাট আশোক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজধানী পাটনায়। এছাড়াও মোঘল সম্রাট আকবর ১৫৯০-এর দশকে আগ্রায় বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীদের মধ্যে বিশ্বের প্রথম সুপরিকল্পিত প্রকাশ্য আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেটা এমন এক সময়ে করা হয় যখন ইউরোপে ধর্মীয় অপরাধ তদন্তের জন্য রোমান ক্যাথলিক জাজকদের বিচার সভা চলছিল" (বিস্তারিত দেখুন Amartya Sen, `` Contrary India`` *The Economists*, December ৩,২০০৫)। 'গণতন্ত্র' চর্চার অত্যাবশ্যকীয় উপদান হিসাবে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠায় যে 'সুশীল সমাজের' ভূমিকার কথা ইদানিংকালের বহুল আলোচিত বিষয়, এর উৎপত্তি কিন্তু মধ্যযুগের মুসলিম দেশগুলির *কফি হাউসগুলিতে*, যেখানে বসে সচেতন নাগরিকরা শাসক ও শাসন ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন। Wickens তাঁর গবেষনায় দেখিয়েছেন যে, আজকের উন্নত পাশ্চাত্য প্রশাসনিক সংগঠনের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য হতে বহু সামরিক ও বেসামরিক শব্দ ও ধারণা গ্রহণ করেছে যেমন, Diwan n‡Z ‡d«Ý *Douane*; Bs‡iwR Tariff, Custom-house, Tare, Admiral, Arsenal Ges Barbican ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে আরব (Savory, ১৯৭৬)।

উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও শাসকেরা যখন বহু লোকের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে ধারণ করার সহিষ্ণুতায় স্বীকৃতি প্রদান তথা উৎসাহিত করছিলেন, তার পাশাপাশি সেসময়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে

ইউরোপে Galillio Gallilli (১৫৬৪-১৬৪২খ্রিঃ)-এর ক্ষেত্রে আমরা যে ধর্মবিচার সভা প্রত্যক্ষ করেছি, তেমনটির নজির ইসলামের তথা প্রাচ্যের ইতিহাসে নেই। গ্যালিলিও কিন্তু যথাযথই দিক্ নির্দেশ করেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। অথচ গ্যালিলিওকে এই সত্য প্রচারের জন্য চার্চের সামনে নতজানু হয়ে অনুশোচনা করে বলতে হয়েছিল যে, তিনি যা বলেছেন তা ঠিক নয়! কিন্তু মানবজাতি আজও জানে যে, গ্যালিলিওই ছিলেন সঠিক। গ্যালিলিওর পূর্বে এজাতীয় মতামত প্রকাশের জন্য চার্চের নির্দেশে ইতালীর জ্যোতির্বিদ ও চিন্তাবিদ Leonardo Bruno (১৫৪৮-১৬০০খ্রিঃ)-কে জ্বালিয়ে মারা হয়েছিল। খলিফা আল-মামুনের সময় বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য বাগদাদে "বায়তুল হিক্মা" নামে জ্ঞানের যে আবাস গড়ে উঠেছিল, এর গ্রন্থাগারে ছয় লক্ষ মূল্যবান গ্রন্থের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছিল। সে তুলনায় সমগ্র ইউরোপের দেশগুলির গ্রন্থাগারসমূহে সেসময়ে সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র বার হাজার! তাও আবার এসবের অধিকাংশই ছিল আরবী গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ। *অরিয়েন্টালিস্টদের* দৃষ্টিতে প্রাচ্য সাহিত্য শুধু *রোমান্টিকতায়* ভরা! কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিদ্পাই নামক জনৈক ভারতীয় দার্শনিক কর্তৃক স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন দু'টি পশুচরিত্র (শৃগাল) অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রচিত *পঞ্চতন্ত্র (যা কালীলা ওয়া দিমনা* নামে প্রথমে পাইলভী ভাষায় রুপান্তরিত এবং পরবর্তীতে আরও ৪০টি ভাষায় অনুদিত*)* ধ্রুপদী রাজনৈতিক সাহিত্য হিসাবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একই ভূখন্ডে বসবাসকারী বহু সম্প্রদায় ভিত্তিক 'জাতিগঠন' ও 'সাংবিধানিক সরকার' ব্যবস্থা হচ্ছে মূখ্য উপজীব্য বিষয়। পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়া আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হিসাবে অরাজক পরিস্থিতি হতে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় মানুষের মাঝে 'সামাজিক চুক্তির' **(Social Contract)** মাধ্যমে সরকার গঠন তথা রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা পড়ানো হয়। এই তত্ত্বের উদ্যোক্তা হলেন সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনৈতিক দার্শনিক Thomas Hobbes (১৫৮৮-১৬৭৯), John Locke (১৬৩২-১৭০৪) এবং Jean Jacque Rousseau (১৭১২-১৭৭৮)। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে জাতিগঠন ও সাংবিধানিক সরকার গঠনের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৩ খ্রিঃ) মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত ***মদিনা সনদ*** **।** এই সনদের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সাংবিধানিক সরকার তথা ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে। সাংবিধানিক সরকার গঠন ও মদিনায় বসবাসকারী বহু ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে নিয়ে একই *উম্মা* যা সহিষ্ণু জাতি গঠনের অনুপম উদাহরণ হচ্ছে এই **মদিনা সনদ।**

আমাদের লোক-প্রশাসন চর্চা সম্পর্কিত অপর যে প্রশ্নটি মূখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে, বিগত একশত বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য জগতে লোক-প্রশাসন সম্পর্কিত জ্ঞান ভান্ডার সৃষ্টির পূর্বে আমাদের জনপদে সরকার বা প্রশাসন বলে কি কিছু ছিল না? লোক-প্রশাসনের উন্নয়নে আমাদের পূর্ব পুরুষদের কি কোন অবদান বা ঐতিহ্য নেই? যদি থেকে থাকে, তাহলে বর্তমান প্রজন্ম অবশ্যই সেটা জানার অধিকার রাখে। অবশ্যই আমাদের ঐতিহ্যে বর্তমান প্রজন্ম গৌরবান্বিত বোধ করার মত বহু উপকরণ ছড়িয়ে আছে। আমরা কি জানি যে, আজ হতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বুকে প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন মৌর্য সম্রাট অশোক? অশোকের রাষ্ট্রীয় দর্শন ছিল **ধর্মমঙ্গল** (অর্থাৎ জনগণের কল্যাণের মাধ্যমে মানুষের মন জয়, এবং যুদ্ধ নয়, এই মনজয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো)। *মনুষ্য চিকিৎসালয়ের* পাশাপাশি পশু চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা, জনগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপন, প্রাণী বৈচিত্র রক্ষার্থে পশু-পক্ষী নিধন নিষিদ্ধকরণ, জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ,বন্দীদের সাথে সদাচরণ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি ছিল অশোক প্রতিষ্ঠিত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইদানিংকালে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারী সমাজের উন্নতির জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় গঠনের কথা শুনি, কিন্তু ভারতে তথা বিশ্বের ইতিহাসে **স্ত্রীমহাধ্যক্ষ** বা মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী প্রথম নিয়োগ করেছিলেন মহামতি অশোক। আমরা বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে প্রবীণ ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান কর্মসূচী প্রবর্তনের কথা শুনি। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে জনজরিপের মাধ্যমে প্রসূতি মা'সহ সমাজের প্রবীণ ও অসহায়দের চিহ্নিতকরণ ও তাদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন মদিনা ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় *খলিফা* হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (Bureay,১৯৮৫:২৫৪)। আমরা যে আজ জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে দেশব্যাপী খাবার ও ঔষধ ইত্যাদিতে ভেজাল বিরোধী মোবাইল কোর্টের অভিযানের কথা শুনি, এটি এসেছে ইসলামী খিলাফতের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ***হিস্‌বা*** (বাজার পরিদর্শক) হতে। আমাদের সংবিধানের ৭৭নং ধারায় প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরক্ষা হিসাবে ***অম্বুড্‌সম্যানের*** কথা বলা হয়েছে। এটি হচ্ছে ইসলামী প্রশাসনের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান *দিওয়ান-ই-মাজালীম* –এর উত্তরসূরী (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের, *প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা* প্রতিরোধে ***অম্বুড্‌সম্যান,*** ২০০১)।

পাশ্চাত্য সাহায্য সংস্থাসমূহের মুখে আজ আমরা **সুশাসন** (Good governance) প্রতিষ্ঠার হেদায়েত শুনি। কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, **জিন** বা মানব কল্যাণমূখী সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী প্রশাসকদের আত্মিক উন্নয়নে সুসংহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন চৈনিক শিক্ষাগুরু Confucious। আবার নৈর্ব্যক্তিতার ভিত্তিতে লোক- প্রশাসকদের যোগ্যতা যাচাই, শৌচ-অশৌচ পরীক্ষার মাধ্যমে সততা নিশ্চিতকরণের সুসংহত পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের উজীর কৌটিল্য। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* (খ্রিঃপূর্ব ৩২১-৩০০ সময়ের মধ্যে লিখা) আজও লোক-প্রশাসন বিষয়ে একটি ধ্রুপদী সাহিত্য হিসাবে বিবেচিত। এছাড়াও একটি ন্যায় ভিত্তিক ও কল্যাণকর প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মিশরের গভর্ণরের প্রতি সুষ্পষ্ট নির্দেশনা সম্পর্কিত *খলিফা* আলীর (রাঃ) *প্রশসানিক চিঠিতে* (৬৫৮-খিস্টাব্দে লিখা) প্রতিফলিত হয়েছে ইসলামের সুমহান ও সুসংহত প্রশাসনিক নীতিমালা। এখানে উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিককালে একটি মুসলিম দেশের প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে নিয়োজিত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন দু'জন সমসমায়িককালের পাশ্চাত্য লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞ Luther Gulick Ges James Pollock কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে যে, ÒIslamic culture is one of the best bases for a strong and successful government and a strong and efficient bureaucracy in modern times (*The organization of Government Administration of the United Arab Republic*, ১৯৬২)। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের North Carolina বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রণীত Mohammad Al-Buraey-Gi *Administrative Development: An Islamic Perspective* শীর্ষক *পি.এইচ.ডি* অভিসন্দর্ভটি Kegan Paul International কর্তৃক London, Sydney এবং New York হতে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৫)। এতে পাশ্চাত্য প্রশাসনিক মডেল সমূহের সাথে তুলনামূলক আলোচনায় ইসলামী প্রশাসনের উন্নততর অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে।

এছাড়াও সুষ্ঠ প্রশাসন সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে সুচিন্তিত পরামর্শ রয়েছে ইমাম আল্ গাজ্জালী (*ইয়াহ্ইয়া-আল্-উলুম্ আল্-দ্বীন*), ইব্নে খাল্দুন (*আল্-মুকাদ্দিমা*), আল্-ফারাবী (*সিয়াসত আল্-মদনী*), আল্-মাওয়ার্দী (*আল্-আহ্কাম আল্-সুলতানিয়া*), নিযাম-উল্ মুলক (*সিয়াসাতনামা*) এবং আবুল ফজলের (*আইন-ই-আক্বরী*) গ্রন্থাবলীতে।

এই যে কৌটিলের *অর্থশাস্ত্র*, এই যে কনফুসিয়াস দর্শন বা অশোকের ***ধর্মমঙ্গল*** কর্মসূচী এবং মহানবী (সঃ) ও *খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের* প্রশাসন−−এগুলিই হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গৌরব। এগুলিইত মিশে আছে আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে। এক্ষেত্রে UNESCO এর প্রাক্তন মহাপরিচালক Rena Meheu এর বহুল ব্যবহৃত উক্তি হচ্ছে, "Ce qui est le divelopment c'st lorsque la seience devient la culture'', অর্থাৎ একটি জাতি উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছবে যখন এর প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রের বিজ্ঞানসমূহ এর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দেশজ পদ্ধতিতে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হবে। এর অন্তর্নিহিত বাণী হচ্ছে, আমরা অবশ্যই আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করব, তবে তা হবে অনুঘটক হিসাবে, দেশজ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে নয়।

অতএব, লোক-প্রশাসনে "প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা" অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গড়ে উঠা এবং আমাদের ঐতিহ্যে লুকিয়ে থাকা উপকরণ সংগ্রহপূর্বক, তা পাশ্চাত্যের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সময়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ও দেশের উপযোগী এক অর্থবহ প্রশাসন গড়ে তোলার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। সেটাই হবে দেশকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ও জাতীয় উন্নয়নে আমাদের সৃজনশীল অবদান। লোক-প্রশাসন অধ্যয়নের সার্থকতা সেখানেই।

নবাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১. Al-Buraey , Mohammad, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London : KPI. Ltd.,
১৯৮৫).

২. Chien, Doh-Joon , *Eastern Intellctuals and Western Solutions* : *Follower Syndrome in Asia* (New Delhi
: ViKas Publishing House Ltd ; ১৯৮০).

৩. Heady, Farrel , *Public Adminstration: A Comparative Perspective,*Third Edition (New York : Marcel
Dekker Inc ., ১৯৮৪).

৪. Lichtenstadter, I. , *Islam and the Modern Age* (New York: Bookman Associates, ১৯৫৮).

৫. Rahman , Anisur, *People's Self-Development* (Dhaka : University Press Ltd, ১৯৯৪).

৬. Riggs , Fred W., *The Ecology of Public Administration* (London:Asia Publishing House, ১৯৭৫).

৭. Said , Edward W., *Orientalism* (New York: Panthcon Books, ১৯৭৮).

৮. Savory, R.M. (ed.), *Intruduction to Islamic Civilization* (Cambridge: Cambridge University Press, ১৯৭৬).

৯. Schacht, J. and Bosworth, C.E. (eds.), *The Legacy of Islam* (Oxford: Clarendon Press, ১৯৭৪).

১০.Watt, W. Montgomery, *The Influence of Islam on Mediaval Europe* (Edinburgh: Edinburgh University
Press, ১৯৭২).

-------o o o ---------